সংখ্যা /৩৩

জনসমবায়

গণমানুষের বুলেটিন

পরিবর্তনের জন্য ঐক্য

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

সম্পাদকীয়

নারী কৃষকদের সমবায়ের নিবন্ধন এবং আইএলও কনভেনশন ১৪১-এর অনুমোদন এখন সময়ের দাবী

বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে ৮০% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উৎপাদন ও চর্চার উপর নির্ভর করে। দেশের গ্রামীণ জনপদের প্রায় ৭১.৫% নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। ধান থেকে শুরু করে সবজি, পশুপালন থেকে হাঁস-মুরগী পালন - নারীরা কৃষির প্রতিটি ধাপে অবদান রাখছেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কৃষিকাজে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও পারিবারিক কৃষক, আর এই ক্ষুদ্র কৃষি উৎপাদনে নারী শ্রমের অবদান অনস্বীকার্য। তাই খাদ্য নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত খাদ্য যোগানে আদি কাল থেকে নারীর ভূমিকা অপরিসীম।

গ্রামীণ নারীরা বিশেষ করে বাড়ির আঙিনা বা আশেপাশের জমিতে খাদ্য উৎপাদন করেন। তারা জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে পরিবারের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করেন এবং বাজারেও অবদান রাখেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এসব নারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ফলে সরকারি কৃষি বিভাগ, ভর্তুকি, প্রযুক্তি সহায়তা কিংবা প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের শ্রম, জ্ঞান ও অবদান আড়ালে থেকে যায়।

অন্যদিকে, নারীরা অধিকাংশ সময় এককভাবে কাজ করেন, গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি তারা কৃষি কাজেও অবদান রাখছেন, ফলে তাদের না আছে গৃহস্থালী কাজের স্বীকৃতি না আছে কৃষক হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি, যা তাদের ক্ষমতায়নকে সীমিত করে রাখে। যদিও অল্প কিছু এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে নারী কৃষকরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। কৃষিকেন্দ্রিক নারী সংগঠন বা সমবায় গড়ে তোলার মাধ্যমে তারা সম্মিলিত শক্তি অর্জন করতে পারছে। এ ধরনের সমবায় শুধু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতেই নয়, বরং স্থানীয় পর্যায়ে বাজারজাতকরণ, কৃষিজ্ঞান বিনিময়, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক সঞ্চয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

কিন্তু এই সংগঠনগুলোও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। সরকারি সমবায় অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ সহায়তা না পাওয়ায় তাদের উদ্যোগ সীমিত আকারেই রয়ে গেছে। অথচ যথাসময়ে সমবায়ের নিবন্ধন ও স্বীকৃতি প্রদান করা গেলে নারীরা সরকারি প্রণোদনা, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবেন। তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে ন্যায্য দামে বিক্রির সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।

এখন সময় এসেছে, কৃষিকেন্দ্রিক নারী সংগঠনগুলোকে সমবায়ের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও নিবন্ধন দেওয়ার। এর ফলে নারীরা কেবল নিজেদের সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না, বরং দেশের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ অর্থনীতি ও টেকসই উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারবেন। সরকারের উচিত এই বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া।

নারীর অবদানকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলে দেশের কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার কাঠামো অর্ধেক থেকে যাবে। তাই নারী কৃষকদের শক্তিকে সংগঠিত, সুরক্ষিত এবং জোরদার করতে সমবায়ের নিবন্ধন সহজতর করা এখন সময়ের দাবি। সে জন্য সমবায় আইনের সময়োপযোগী, নারী ও প্রান্তিক কৃষকবান্ধব সংস্কার যেমন অত্যন্ত জরুরি তেমনি গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় আইএলও কনভেনশন ১৪১-এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন বা অনুস্বাক্ষরও অপরিহার্য।

শামসুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক
এএলআরডি

কৃষিজমি রক্ষা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আফজাল হোসেন

সমবায় নিছক একটা পদ্ধতি নয়, ব্যবস্থা বদলের হাতিয়ারও বটে। রাষ্ট্রসংস্কার কিংবা নতুন বন্দোবস্তের রাষ্ট্র বিনির্মাণে এ পদ্ধতি প্রচলিত সামন্ত ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিপীড়ন থেকে মানবজাতিকে উদ্ধারে সহায়ক। এই ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার, সামাজিক মর্যাদা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়, যেটা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশের সংবিধানে 'সমবায় মালিকানার বিষয়টি লিপিবদ্ধ আছে'। যেখানে আপামর জন ও গণের মুক্তির উপায় সেটাকে মোটেও হাল্কাভাবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

সমবায় ব্যবস্থা উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। সকলের অংশগ্রহনের সুযোগ থাকায় গণতান্ত্রিক চর্চা প্রসারিত হয়। আলোচনার সুযোগ থাকায় এই পদ্ধতিতে জ্ঞানসমৃদ্ধিও ঘটে। ব্যয় সংকোচনের সুযোগ থাকায় এটি অধিক লাভজনক। সর্বস্তরে সমবায় চর্চায় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো যায়। তবে সরকারের ভ্রান্তনীতি এই অগ্রযাত্রায় অন্তরায় হতে পারে। কুমিল্লার সুপরিচিত ও সফল দিদার সমবায়চআন্দোলন স্তিমিত হবার পিছনে সমবায় আইনের দূর্বলতা দায়ী। এই আইনে সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ না রেখে সমবায়ীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে এমনটা ঘটতো না। সমবায়ীগণ যাতে স্বাধীনভাবে সমবায় চর্চা করতে পারে আইনে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ স্বাধীন সমবায় চর্চার অন্তরায়। সমবায়ের নিবন্ধন আইন হতে হবে সহায়তামূলক, নিয়ন্ত্রণমূলক নয়।

সকল পেশা, শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গভিত্তিক সমবায় গঠনের উদ্যোগ নিলে ব্যবস্থায়

বদল ঘটবে। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে এদেশের কৃষিতে সংস্কার করে সমবায় পদ্ধতির প্রসার ঘটালে দেশ দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন করবে। মাঠভিত্তিক কৃষিজমির একটি খতিয়ান প্রস্তুত করে প্রত্যেক ভূমি মালিকের মালিকানার সঠিক হিসাব রাখতে হবে। জমি হস্তান্তর হলে শুধু মালিকানা পরিবর্তন হবে। এভাবে কৃষি জমির জন্য ভূমি ব্যাংক প্রস্তুত হবে। প্রকৃত কৃষকের মধ্যে সেই জমি চাষ করার জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হবে। উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের জন্য ব্যাংক বা অন্য অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান অর্থ যোগান দিবে। দেশে প্রচলিত তেভাগা আইনের (১ ভাগ ভূমি মালিক, ১ ভাগ উৎপাদনকারীগণ, ১ ভাগ উপকরণ যেমন- সেচ, সার, যন্ত্র, পুঁজি ইত্যাদি) আলোকে উৎপাদন লব্ধ আয় বিভাজিত হবে। ক্ষুদ্রঋণও এই নীতির আলোকে পরিচালিত হবে। এই ব্যবস্থা গড়া গেলে গ্রামের কোন মানুষ শহরমূখী হবে না। গ্রাম সকল মানুষের যথাযোগ্য কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হবে। সমবায় কৃষিচর্চায় পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর অবদান রাখতে পারে। পরিকল্পিতভাবে সমবায় চর্চায় জমির স্বাস্থ্য রক্ষা ও জমির অপচয় রোধ এবং পরিবেশের ইতিবাচক উন্নয়ন সম্ভব।

কৃষিতে সংস্কার এখন সময়ের দাবী। কৃষি শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য ঘোচাতে হবে। গ্রামে যে শ্রমিক ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা দৈনিক মজুরি পান, শহরে তিনি পান ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। এই বৈষম্য ঘোচাতে কৃষি শ্রমিকের মজুরী দৈনিক ১৫০০ টাকা করা এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে অধিক ৫০% যুক্ত করে নির্ধারণের সুযোগ দিলে তা কৃষি খাতে চরম সুফল বয়ে আনবে। মজুরী বৈষম্যের প্রচলিত ধারণা নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যের চিন্তা থেকে সরে আসা এখন সময়ের দাবী। সকল স্তরে নারী পুরুষ সমমর্যদা ও সমমজুরীর হকদার। গ্রাম ও শহরের মজুরী বৈষম্য আলোচ্য হওয়া জরুরী। এক কেজি লবণ শহরে যে দামে বিক্রি হয়, গ্রামেও একই দামে বিক্রি হলে মজুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য হওয়া অন্যায্য ও 'বৈষম্যহীন' ভাবনার ক্ষেত্রে অন্তরায়।

নারীদের সমবায় নারীবান্ধব কর্মসৃজনে ভূমিকা রাখবে। তারা নিয়মিত জীবনভিত্তিক চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি অর্জন করবে। যুবকগণ সমবায় চর্চায় স্বাস্থ্য গঠন, প্রতিরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক চর্চা দ্বারা সুস্থ, প্রগতিশীল ও নিরাপত্তামূলক গ্রাম উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন। কৃষি কাজের সময় বা ক্ষণ বিবেচনায় রাখা জরুরী। বর্তমানে কৃষি শ্রমিক সকাল আটটায় মাঠে যায় আর দুপুর দুটোর মধ্যেই ফিরে আসে। এটা শস্য ব্যবস্থাপনার অন্তরায়। ভোর বেলা পরিচর্যা করলে গাছপালার ক্ষতি কম। প্রখর রোদে চারাগাছ কাহিল থাকে তখন পরিচর্যায় ক্ষতি সাধিত হয়। আবার পড়ন্ত বিকেলে পরিচর্যায় উপকার হয়। কৃষির চিরায়ত ব্যবস্থা এমনটিই ছিল। সমবায় চর্চায় প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন করা যায়। দুপুরের সময় কৃষি শ্রমিকগণ জ্ঞানচর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সংস্কৃতি চর্চা ও শরীর গঠনের কাজ করতে পারেন। ঐক্য গড়নে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। গ্রাম প্রতিরক্ষায় এবং প্রগতিশীলতার চর্চায় এই পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে।

সমবায় ব্যবস্থায় সমমর্মিতা গড়ে উঠে। নেতৃত্ব সৃষ্টি ও প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ থাকে। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময় নির্ধারণপূর্বক দুপুরের আগেই শিক্ষাক্রম শেষ করে ঐ প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষার আয়োজন করা যায়। গ্রামের শিক্ষায়তনেই উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শহরমুখীতা কমবে। কৃষকের সন্তান কৃষিবিদ বা কৃষিবিজ্ঞানী হবেন গ্রামে থেকেই। শিক্ষাক্রমেও সংস্কার ঘটানো চাই। ক্লাসেই যাবতীয় শিক্ষা চর্চা হবে। ক্লাসের বাহিরে তরুণ কিশোর যুবারা শরীর চর্চা, ক্রিড়া অনুশীলন, সাংস্কাতিক চর্চা কিংবা পারিবারিক কাজে ব্যপ্ত থাকবে। সুস্থ ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়নে এটা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যা নয় চিরায়ত লোকজ্ঞান থেকেই এই শিক্ষার্জন সম্ভব। ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার এনায়েতপুরের হরিপদ কাপালি প্রথাগত বিদ্যার্জন ব্যতীতই নতুন জাতের ধান উদ্ভাবনকারী কৃষিবিজ্ঞানী। আবার ঐ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচাঁদার ওমর আলী ও মকবুল গং জৈব কৃষিচর্চায় অনন্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা প্রায় শতাধিক জাতের ধানবীজ সংগ্রহ করে গণ-গবেষণা করেছেন। তারা এলাকার সামাজিক সমস্যা, যোগাযোগ সমস্যা ও সেচ সমস্যা নিরসন করেছেন যৌথভাবে।

> আমরা যদি সমবায় চর্চাকে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ ও পণ্য বিপণনের কাঠামোতে সীমাবদ্ধ না রেখে সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করি, তবে একটি সহনশীল, ন্যায্য, উৎপাদনমুখী এবং মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। সমবায় হতে পারে আমাদের অলাভজনক উন্নয়ন দর্শন–যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ একসঙ্গে বাঁচে, বেড়ে ওঠে।

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার হুলহুলিয়া গ্রামের মছির উদ্দীন মৃধা প্রায় সোয়াশো বছর আগে গ্রামটিতে সমবায়ের ধারণা প্রয়োগ করেন। আজও গ্রামটি অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বড় বন্যায় ফসলহানী ঘটলে মছির মৃধা প্রতি পরিবার থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়ে সভা করে যার বাড়িতে বীজধান আছে তা সংগ্রহ করে বপন করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে সেবছর ফসল উৎপাদন করেন। তারপর থেকে গ্রামটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গর্বের সাথে রয়েছে। সে গ্রামে কোনো দিন পুলিশ ঢোকার প্রয়োজন হয়নি। গ্রামটি শতভাগ শিক্ষিত, কোনো বাল্যবিবাহ নেই, বেকারত্ব নেই, দারিদ্র্য নেই। স্কুল, মাদ্রাসা, ক্লাব সকল প্রতিষ্ঠান গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রয়োজনে গ্রামের বিচার-সালিশ করার জন্য গ্রাম আদালত আছে। এ যেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরেক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ! যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় ছিল। এই স্বপ্নের গ্রাম তথা দেশ গড়তে দরকার মছির উদ্দীন মৃধার মত কতিপয় মছির উদ্দীন। কেবলমাত্র সমবায় আন্দোলন সেই স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হতে পারে।

আমরা যদি সমবায় চর্চাকে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ ও পণ্য বিপণনের কাঠামোতে সীমাবদ্ধ না রেখে সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করি, তবে একটি সহনশীল, ন্যায্য, উৎপাদনমুখী এবং মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। সমবায় হতে পারে আমাদের অলাভজনক উন্নয়ন দর্শন–যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ একসঙ্গে বাঁচে, বেড়ে ওঠে। ■

লেখক: মানবাধিকার, পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মী এবং নির্বাহী পরিচালক, রুলফাও, রাজশাহী।

প্রান্তিক কৃষকের কৃষি মেলা: সমবায়ের শক্তি, অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা

তারা খাতুন

একই অঙ্গে বহু রূপ - এই প্রবাদটির জীবন্ত উদাহরণ হতে পারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কৃষি মেলা। এই মেলাটি ছিলো এক অনন্য সমাবেশ, যেখানে একত্রিত হয় বিভিন্ন জেলার জনসমবায়ী সদস্য, কৃষক-কৃষাণি ও সাধারণ মানুষ। এটি ছিলো একাধারে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উন্মুক্ত মঞ্চ, জৈব কৃষিচর্চার প্রচারণার ক্ষেত্র এবং কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের আনন্দমেলা।

তবে শুধু প্রদর্শনী ও উৎসবেই সীমাবদ্ধ ছিল না এর আবেদন। কৃষি ও কৃষককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালার সংস্কার, বাজার ব্যবস্থায় প্রান্তিক ও সমবায়ী কৃষকদের প্রবেশাধিকার এবং সমবায়ভিত্তিক যৌথ চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবস্থার প্রবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলোও তুলে ধরা হয় নীতিনির্ধারকদের সামনে। এইভাবে কৃষি মেলাটি হয়ে উঠেছে একইসাথে চেতনার উদ্ভাস, আন্দোলনের ভাষ্য এবং বিকল্প উন্নয়ন ভাবনার এক বাস্তব রূপ।

সমবায়ের পথে প্রান্তিকের শক্তি: কৃষি মেলা থেকে শিখন

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত 'প্রান্তিক, নারী ও আদিবাসী কৃষকদের কৃষি মেলা ২০২৪' ছিল কেবল একটি প্রদর্শনী নয়–বরং প্রান্তিক কৃষকদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার এক জীবন্ত দলিল। এই মেলা যেন হয়ে উঠেছিল মাঠ-ঘাট পেরিয়ে উঠে আসা কৃষকদের কণ্ঠস্বর, যাঁদের প্রতিটি অভিজ্ঞতা বহন করে একেকটি আন্দোলনের গল্প। শতাধিক নারী ও আদিবাসী কৃষকের অংশগ্রহণ, তাঁদের জীবনের লড়াই, চাষাবাদের নতুন নতুন কৌশল ও

সম্মিলিত প্রয়াস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে–সমবায়, যৌথ কৃষি আর সম্মিলিত বিনিয়োগই হতে পারে আগামী দিনের টেকসই কৃষির মূলভিত্তি। এই আয়োজন আমাদের শিখিয়েছে, পৃথক পৃথক প্রয়াস নয়–বরং একতাবদ্ধ পথচলাই প্রান্তিক কৃষকের প্রকৃত শক্তি।

সমবায়: সাহস ও সম্মিলনের শক্তি

সমবায় মানে শুধু দল গঠন নয়; এটি এক ধরনের বিকল্প অর্থনীতি ও সামাজিক সংগঠনের কাঠামো, যা পারস্পারিক সহযোগিতা, ন্যায্য বণ্টন ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মেলার অভিজ্ঞতা থেকে বারবার উঠে এসেছে যে, প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এই সমবায়ই হলো লড়াইয়ের হাতিয়ার, নিরাপত্তার আশ্রয় এবং সম্ভাবনার দরজা।

আমাদের দেশের বাস্তবতায় দেখা যায়–একজন ক্ষুদ্র কৃষক একা উৎপাদন করলেও ন্যায্য দাম পান না; বাজারে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না; অথচ সার-বীজ কিনতে গিয়ে পড়েন উচ্চমূল্যের চাপে। অন্যদিকে, যখন ২০ থেকে ৫০ জন কৃষক একত্রে সমবায় গঠন করে যৌথভাবে চাষাবাদ করেন, পুঁজি বিনিয়োগ করেন ও পণ্য বাজারজাত করেন–তখন শুধু লাভই বাড়ে না, ঝুঁকিও কমে যায়।

আজও দেশের বহু প্রান্তিক কৃষক পারিবারিক কৃষি পদ্ধতিতে এককভাবে উৎপাদন করে চলেছেন, কিন্তু বাজার, প্রযুক্তি, মূলধন কিংবা জমির মালিকানায় বারং বার হোঁচট খাচ্ছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ প্রান্তিক ভূমিহীন, ক্ষুদ্র চাষী বা কৃষকেরা। আর যদি হয় সেই কৃষকটি নারী, তাহলে তো কথাই নেই। যার প্রমাণ মেলে কৃষি মেলায় আসা অনেক নারী কৃষকদের বক্তব্য থেকে। কৃষি মেলায় আসা অনেক নারী কৃষক জানালেন, এক দশক আগেও তাঁরা জমির মালিক ছিলেন না, এমনকি বর্গাচাষের জন্যেও জমি সহজে পেতেন না। বাজারে ঢুকতে ভয় পেতেন, তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কী হবে–সেটাও ঠিক করতেন অন্য কেউ।

কিন্তু আজ ছবিটা বদলেছে। এখন তারা নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন জনসমবায়– যা শুধুমাত্র একটি সংগঠন নয়, বরং এটি এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন। যা নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, জমির অধিকার, উৎপাদনে নেতৃত্ব এবং বাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ। জনসমবায়ের মাধ্যমেই তাঁরা এখন নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছেন –কোন ফসল চাষ করবেন, কোথায় বিক্রি করবেন, কিভাবে মূল্য সংযোজন করে বেশি আয় করবেন।

মেলায় অংশ নেয়া সব জনসমবায় দলের অভিজ্ঞতা বলে, এই সমবায় তাঁদের শুধু সংগঠিতই করেনি, তাদের মর্যাদাও ফিরিয়ে দিয়েছে। সেইসাথে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রাণী ও কৃষিসহ অন্যান্য সরকারি পরিসেবা প্রাপ্তি। সহজ হয়েছে ব্যাংক ও এনজিও ঋণ প্রাপ্তিও। যা ইতিপূর্বে বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান একক কৃষককে ঋণ দিতে চাইত না, এখন সমবায়ের গ্যারান্টিতেই সহযোগিতা করছে।

সমবায়ের আরেক অনন্য দিক হলো জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময়ের সুযোগ। কেউ জৈব কৃষিতে দক্ষ, কেউ বীজ সংরক্ষণে অভিজ্ঞ–তাঁরা একে অপরকে শেখান, সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। এই মেলাতে দেখা গেল–এক জেলার সদস্য অন্য জেলার সদস্যদের শেখাচ্ছেন কীভাবে একই জমিতে তিন ধরনের ফসল চাষ করা যায়, কীভাবে স্থানীয় বাজারে সরাসরি কৃষিপণ্য বিক্রি করা যায় মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই।

এইভাবেই জনসমবায় গড়ে তুলছে এক নতুন সম্ভাবনার সমাজ–যেখানে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা যেমন বাড়ছে, তেমনি জন্ম নিচ্ছে সম্মিলিত নেতৃত্বের সংস্কৃতি। নারী, যুব ও আদিবাসী সদস্যরা এখন আর সিদ্ধান্তের বাইরের কেউ নন–তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কৌশল নির্মাণ করছেন এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা আঁকছেন।

সবচেয়ে বড় কথা, এই সমবায়গুলো এখন নিজ নিজ এলাকার ভূমি অধিকার, পানি ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি আন্দোলন ও বাজার সংস্কারের প্রশ্নে সাহসের সঙ্গে সোচ্চার হচ্ছে। সমবায় তাই কেবল অর্থনৈতিক কাঠামো নয়–এটি একটি রাজনৈতিক শক্তি, যা সমাজের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লড়াইতেও ভূমিকা রাখছে।

যৌথ কৃষি: খণ্ডিত জমিকে একত্রিকরণের গল্প

আমাদের দেশের কৃষিজমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় যৌথ বা সমবায় উদ্যোগে চাষাবাদ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া কৃষির যান্ত্রিকীকরণ একটি বড় সমস্যা। কিন্তু কৃষি মেলায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নারী জনসমবায়ীদের সাথে আলোচনায় জানা গেল যে, তারা ১০-২০ জন সমবায়ী মিলে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে ১-২ একর জমি একত্র করে যৌথভাবে চাষাবাদ করছেন এবং ভাগ করে নিচ্ছেন শ্রম, খরচ, ঝুঁকি ও লাভ। তারা মনে করেন, যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদের জন্য নীতিগত নির্দেশনা ও সহায়তা দেওয়া হতো, তবে এই মডেল কৃষিক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারত। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এটি হয়ে উঠত এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

যৌথ বিনিয়োগ: পুঁজিহীনতা থেকে স্বনির্ভরতা

টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে মেলায় অংশগ্রহণকারী একজন আদিবাসী বর্মন জনগোষ্ঠীর সমবায়ী নারী কৃষক কাজলী রানী বর্মণ বলছিলেন, "জনসমবায় শুরুর সময় হাতে পুঁজি বলতে কোনো কিছুই ছিল না। সমবায়ের নারী সদস্যরা মাসে ১০০ টাকা করে জমিয়ে তৈরি করেছি একটি যৌথ পুজিঁ। এখন আমরা প্রয়োজনে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ঋণ দিতে পারি, বীজ কিনিতে পারে, গোডাউনও বানিয়েছি।"

এটাই যৌথ বিনিয়োগের সৌন্দর্য–এটি শুধু অর্থ নয়, এটি বিশ্বাস; পারস্পারিক নির্ভরতার ও সম্মিলিত পরিকল্পনার বিষয়। যখন প্রান্তিক কৃষকরা নিজেরাই গড়ে তোলেন ক্ষুদ্র পুঁজি, তখন তারা আর উচ্চ সুদের ঋণের জালে আবদ্ধ থাকেন না। তারা হয়ে ওঠেন স্বনির্ভর, সাহসী ও সম্মিলিত শক্তির প্রতীক।

নারী নেতৃত্ব: জনসমবায়ের প্রাণশক্তি

এই কৃষি মেলার সবচেয়ে উদ্দীপনাময় বার্তা–নারীরা এখন শুধু সহযাত্রী নন, বরং পথপ্রদর্শক। একসময় যারা ছিলেন জমির মালিকানার বাইরে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রান্তে–আজ তারাই জনসমবায়ের সভাপ্রধান, কোষাধ্যক্ষ কিংবা সংগঠন ব্যবস্থাপক। নেতৃত্বের আসনে বসে তারা পাল্টে দিচ্ছেন কৃষির মানচিত্র। মেলায় অংশগ্রহণ করা জনসমবায় দলের সদস্য জয়ন্তী রানী মুর্মু নামে আদিবাসী নারী বলছিলেন, "আগে মাঠে কাজ করতাম চুপচাপ। এখন সিদ্ধান্ত নেই–কী চাষ করব, কোথায় বিক্রি করব, কারো কাছে ঋণ নেব কি না? তা আমরা ঠিক করি।"

নারীদের এই রূপান্তরের পেছনে রয়েছে সমবায় কাঠামো, যেখানে গণতান্ত্রিক চর্চা হয়; নেতৃত্ব নির্বাচন হয় গণতান্ত্রিকভাবে এবং প্রতিটি সদস্যের কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ। এই কাঠামো নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছে। নারী নেতৃত্ব শুধু সমবায়ের ভিত শক্ত করে না, বরং তা পরিবার, সমাজ ও স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। একজন নারী নেত্রী যখন নিজে সিদ্ধান্ত নেন, দল পরিচালনা করেন, বাজার বোঝেন–তখন তা হয়ে ওঠে একটি প্রজন্মান্তরের অনুপ্রেরণা। কারণ তখন শিশুরাও দেখে, "নারী মানে শুধু অনুসরণ নয়–নারী মানেই নেতৃত্ব।"

আসুন, আমরা সবাই মিলে কৃষকবান্ধব সমবায় আইন ও কৃষি নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে আন্তরিক আহ্বান জানাই। আমরা সবাই মিলে জোর কণ্ঠে আহ্বান জানাই– **হোক কৃষকের পাশে রাষ্ট্র, হোক সমবায়ভিত্তিক ন্যায্য কৃষি নীতি ও আইন প্রণয়ন, যা দেবে প্রান্তিক কৃষকদের হাতে অর্থনীতি বদলে দেওয়ার চাবিকাঠি।**

মেলার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক হলোঃ

১. আত্মবিশ্বাসের জায়গা তৈরি: যৌথ উদ্যোগে কৃষকরা নিজেরাই নেতৃত্ব নিচ্ছেন। নারী কৃষকরা বলেছেন–"আগে সিদ্ধান্ত নিত অন্য কেউ, এখন আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিই।"

২. ভূমির সুরক্ষা: যৌথভাবে লিজ নেওয়া জমিতে কৃষকের অবস্থান স্থায়ী হয়, জমির ব্যবহার হয় দক্ষ ও নারীর ভূমি অধিকারে সচেতনতা তৈরি হয়।

৩. টেকসই বাজার সংযোগ: সমবায়ভিত্তিক দলগুলো এখন নিজেরাই ভোক্তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে, নিজস্ব ব্র্যান্ডে বিক্রি করছে।

৪. জলবায়ু অভিযোজন: যৌথ কৃষি ও দেশজ প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষকদের জলবায়ু ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।

নীতিগত বার্তা: প্রয়োজন কৃষকবান্ধব সমবায় আইন ও পলিসি

- এ মেলা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বিদ্যমান সমবায় আইন এবং কৃষি ঋণ নীতিমালাগুলো প্রান্তিক কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। মর্টগেজ ছাড়া কৃষিঋণ, কৃষকের পরিচয় ও পণ্য বিপণনে সহায়তা–এসব বিষয়ে এখনই কার্যকর নীতিগত সিদ্ধান্ত দরকার।
- জনসমবায়ের মতো বিকল্প ও কৃষককেন্দ্রিক মডেলগুলোকে আইনি স্বীকৃতি ও সরকারি সহায়তার আওতায় আনতে না পারলে, এই অর্জনগুলো টেকসই হবে না।

সমবায় মানে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

'প্রান্তিক, নারী ও আদিবাসী কৃষকদের কৃষি মেলা ২০২৪' আমাদের শিখিয়েছে–জনসমবায়, যৌথ কৃষি ও যৌথ বিনিয়োগ শুধু অর্থনৈতিক মুক্তির কৌশল নয়, এটি প্রান্তিক মানুষের সম্মান, আত্মমর্যাদা ও নেতৃত্ব গঠনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এই মডেল আর শুধু গ্রামীণ উদ্যোগে সীমাবদ্ধ নয়–এটি হয়ে উঠতে পারে জাতীয় নীতির অন্যতম ভিত্তি। এর মাধ্যমে ভূমি ও কৃষির আমূল সংস্কার ঘটিয়ে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। সেই সঙ্গে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি গড়ে ওঠে স্বনির্ভরতা ও একটি টেকসই কাঠামো–যার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচন সম্ভব। আসুন, আমরা সবাই মিলে কৃষকবান্ধব সমবায় আইন ও কৃষি নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে আন্তরিক আহ্বান জানাই। আমরা সবাই মিলে জোর কণ্ঠে আহ্বান জানাই– **হোক কৃষকের পাশে রাষ্ট্র, হোক সমবায়ভিত্তিক ন্যায্য কৃষি নীতি ও আইন প্রণয়ন, যা দেবে প্রান্তিক কৃষকদের হাতে অর্থনীতি বদলে দেওয়ার চাবিকাঠি।**

সমবায় মানে শুধু সংগঠন নয়–এটি এক স্বপ্নের নাম, সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। ■

লেখক- একজন উন্নয়ন কর্মী

পর্যবেক্ষণী প্রতিবেদন:
প্রান্তিক, নারী ও আদিবাসী কৃষকদের কৃষি মেলা একটি জনসমবায়ী উদ্যোগ

"এক হাতে হাল, আরেক হাতে অধিকার"–এই চেতনায় ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো- প্রান্তিক, নারী ও আদিবাসী কৃষকদের এক যৌথ কৃষি মেলা। পারিবারিক পর্যায় গ্রামীণ নারী কৃষকদের কৃষি কেন্দ্রিক জৈব ও যৌথ উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান এবং নারী ক্ষমতায়নের বিষয়গুলো তুলে ধরাই ছিলো এই মেলার মূল উদ্দেশ্য ।সারা দেশের ১০টি জেলার প্রায় এক'শ জন প্রান্তিক, নারী ও আদিবাসী কৃষকেরা অংশ নিয়েছেন। শুধু অংশগ্রহণই নয় তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও বিপণনের নিমিত্তে মেলায় স্টলও দিয়েছেন। এই কৃষকদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য ২টি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে এতে। ময়মনসিংহের জয়নুল উদ্যানে অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সমাজসেবার উপ-পরিচালক, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া মেলায় সারা দেশ থেকে ২৮টি বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগ অংশগ্রহণ করেছে। এটি সম্পূর্ণই একটি যৌথ ও সমবায়ী উদ্যোগ। যেহেতু নারী কৃষকদের এই যৌথ চাষাবাদের উদ্যোগটি প্রচলিত সমবায় আইনে সমবায় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাদকতা রয়েছে, তাই তারা এই উদ্যোগটিকে 'জনসমবায়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কেন এই উদ্যোগ:

এই ধরনের উদ্যোগ মূলত: বিগত কয়েক বছর যাবৎ চলমান রয়েছে। তবে এর বৈশিষ্ট্য হলো- এটি একই জেলায় বা একই জায়গাতে হচ্ছে না। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে আয়োজন করা হচ্ছে। যেহেতু এই উদ্যোগটিতে এএলআরডি সার্বিকভাবে সহায়তা করে থাকে, তাই এই কৃষি মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থার আগ্রহকে এএলআরডি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সুতরাং যে জেলার সহযোগী সংস্থা খুব দৃঢ়ভাবে আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, সেই জেলাতেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকারন্তরে এই মেলার মধ্য দিয়ে জনসমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত

জনগোষ্ঠির জ্ঞান ও দক্ষতার আদান-প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরীর ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে এই ধরনের যৌথ উদ্যোগকে জনপ্রিয় করা; জনসমবায় দলের যৌথ উদ্যোগে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ও বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা; এই মেলার মধ্য দিয়ে নারী কৃষকদের যৌথ জৈব কৃষি চর্চাকে সাধারণ জনগণের কাছে আরো জনপ্রিয় করে তোলা ও উদ্বুদ্ধ করা; উৎপাদিত জৈব পণ্যের বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রদর্শন করা; উদ্ভাবিত উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তিসমূহের পাশাপাশি কৃষিতে স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য জনগণের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি করা; পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে জনগণকে উৎসাহিত করা। অর্থাৎ কৃষকদের টেকসই কৃষি চর্চা উপস্থাপন, কৃষকদের অধিকার ও প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় লোকজ কৃষিজ জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া এবং ন্যায্যবাজার ও বীজের অধিকার নিয়ে দাবি উত্থাপন ও করণীয় নির্ধারণের জন্যই এই ধরণের কর্মকা-ের আয়োজন করা হয়েছে।

সুতরাং এই মেলা একদিকে, জৈব কৃষি ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার-প্রচারণা এবং বাজার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, নারীবান্ধব কৃষি পলিসি তৈরিতে সহায়তা করবে।

উদ্যোগের মূল কারিগর, চেতনা বা শক্তি

এই মেলার পিছনের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে সারা দেশের প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন জনসমবায়ীদের সম্মিলিত কৃষি উদ্যোগ ও চর্চা। প্রশ্ন হলো 'জনসমবায়' তাহলে কী? তা বুঝতে উপস্থিত জনসমবায়ীদের দুই-এক জনের সাথে আলাপ করতে যা বুঝা গেল, তা হলো 'জন' অর্থ জনগণ (এখানে জনগণ হলেন- প্রান্তিক, ভূমিহীন, নারী ও আদিবাসী) আর 'জনসমবায়' মানে হচ্ছে এই জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ বা সমবায়। যদিওবা সমবায় বললেই তা বুঝায় কিন্তু তাদের মতে, সমবায়ের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বা মালিকানা বা ওনারশীপের বিষয়টিতে কিছুটা ঘাটতি থেকে যায়। তাছাড়া জনসমবায় শব্দটি ব্যবহারের পিছনে আরো একটি কৌশলগত কারণ রয়েছে। তা হলো- সমবায় আইন অনুযায়ি 'সমবায়' শব্দটি ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই সরকারের সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত হতে হবে। অন্যথায় এটি ব্যবহার করা যাবে না। জনসমবায় দলের সদস্যদের মতে, সেই নিবন্ধন নিতে অনেক জটিলতা রয়েছে। যেমন-নিবন্ধনের জন্য সরকারি নির্দিষ্ট ফি ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয় এবং এই সমবায়ের নিয়ন্ত্রণ সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাতে থাকে। যা সমবায়ের চেতনাকে নিরুৎসাহিত করে। আমরা সাধারণ মানুষ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 'জনসমবায়' শব্দটি ব্যবহার করছি। ফলে এতে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে, আমরা আমাদের কাছে জবাবদিহি থাকি। আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিই, নিজেরাই কাজ করি। মূলত যৌথভাবে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে ছোট ছোট দল তৈরি করে মুষ্টি চালের মাধ্যমে যৌথ পুঁজি গঠন করে তুলছি"। তারা এই কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম ছোট পরিসরে শুরু করেন। এটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে নারী কৃষক ও নারী কৃষিজীবীদের আন্দোলন। এই আন্দোলন মূলত: একদিকে যৌথ পুঁজিগঠন করে, অন্যদিকে যৌথভাবে জৈব কৃষির চর্চার প্রচলনকে পুনরুজ্জীবিত করছে। কারণ আমাদের দেশের কৃষি একদিকে কিছু কিছু দেশি-বিদেশী কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বিশেষ করে সার,বীজ ও কীটনাশকের বেলায়। ফলে আমাদের উৎপাদিত পণ্য হয়ে ওঠেছে অনিরাপদ। এই খাদ্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাই তৈরি করছে। বিগত একযুগেরও বেশি সময় ধরে এই নারীরা এই আন্দোলনটি চালিয়ে যাচ্ছে স্বল্প পরিসরে। তাদের আলোচনায় বুঝা গেল যে, মোটাদাগে তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে তারা এই জনসমবায়ের আন্দোলনটি চালিয়ে যাচ্ছে। তা হলো- ১. ক্ষুধা, দারিদ্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি ২. সামাজিক মর্যাদা ও বাজার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি এবং ৩. জনবান্ধব একটি সমবায় কাঠামো তৈরি করা।

পর্যবেক্ষণ:

এই ধরনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ সচরাচর দেখা যায় না। যেখানে সকল উদ্যোক্তই নারী এবং তারা নিজেরাই আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। ফলে প্রথমত: এই ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে নারীর নেতৃত্বের একটি বড় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত: নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে বা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটছে তা পরিলক্ষিত হয়েছে। তৃতীয়ত: এই উদ্যোগগুলি প্রচলিত সমবায়কে চ্যালেঞ্জ করে কৃষিভিত্তিক সমবায়কে প্রোমোট করার দিক নির্দেশনা দেয়। চতুর্থত: যৌথ উদ্যোগে একদিকে জৈব কৃষির চর্চাকে সামনের দিকে তুলে আনা এবং অন্যদিকে নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করছে। সবকিছু মিলিয়ে এটি হতে পারে একটি কৃষক সমবায় গঠনের এবং তা চর্চার একটি মডেল। ■

একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রতিবেদন

পঞ্চব্রীহি ধান: কৃষকের সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ, যেখানে ধান শুধু প্রধান খাদ্যশস্যই নয়, মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু হাজার বছরের ধানচাষ মূলত ঋতু নির্ভর এবং প্রতিবার নতুন করে চাষ ও জমি প্রস্তুত করতে হয়। এর ফলে কৃষকের সময়, খরচ ও শ্রম অনেক বেড়ে যায়। তাছাড়া প্রতি বছর বর্ষা ও বন্যার কারণে ধানখেত নষ্ট হয়ে খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী উদ্ভাবন করেছেন "পঞ্চব্রীহি ধান"–যা এক রোপণে পাঁচবার ফলন দিতে সক্ষম। এটি শুধু একটি নতুন ধান নয়, বরং দেশের কৃষি ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনার সূচনা। প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই ধান কৃষকদের সময় ও খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়াবে, পরিবেশের ওপর চাপ হ্রাস করবে এবং খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দুয়ার খুলে দেবে।

ড. আবেদ চৌধুরী, যিনি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের কৃতিসন্তান, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গবেষণা সংস্থায় প্রধান ধান বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছেন। তার গবেষণার অংশ হিসেবে উদ্ভাবিত হয়েছে এই যুগান্তকারী ধান প্রজাতি। তিনি ইতোমধ্যেই ডায়াবেটিস প্রতিরোধক রঙিন ভুট্টা ও লাল রঙের চাল উদ্ভাবন করে বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছেন।

পঞ্চব্রীহি: এক রোপণে ৫ বার ফলন

"পঞ্চ" মানে ৫, আর "ব্রীহি" অর্থ ধান। একবার রোপণে একই শস্য থেকে বছরের ভিন্ন মৌসুমে মোট ৫ বার ফলনের কারণে ধানের নাম হয়েছে "পঞ্চব্রীহি"। ধান উৎপাদনের এই নতুন পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছেন

অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বাংলাদেশি জিনতত্ত্ববিদ ডক্টর আবেদ চৌধুরী। ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের এক সেমিনারের মাধ্যমে তিনি এই উদ্ভাবনের বিষয়টি প্রকাশ করেন। তার এই পদ্ধতিতে প্রথমবার ফসল তোলার পরে ধান গাছ সম্পূর্ণ না কেটে আরও চারবার ফলন পাওয়া যায়।

পঞ্চব্রীহি ধানের সুবিধা

ধান গাছের সাধারণত একবার ফলন পর্যন্ত আয়ু থাকে। কিন্তু এই ধান প্রথমবার ফসল তোলার পর ৪ বার পর্যন্ত বাড়তে পারে। যেকোনো ঋতুতে বৃদ্ধি পাওয়া এই শস্য প্রায় সারা বছর ধান দিতে পারায় এটি বর্ষজীবীর কাতারেও পড়ে।

সাধারণ ধানের ক্ষেত্রে বোরো কাঁটার পরে আউশ রোপণ করা হয়। তারপর আউশের মৌসুমে ফসল তুলে ধরা হয় আমন। এভাবে প্রতিবার চাষের সময় জমি থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো দূষিত গ্যাস নিঃসরণ হয়। কিন্তু পঞ্চব্রীহির ক্ষেত্রে এক চাষেই ৫ বার ফলন পাওয়ার কারণে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ৮০ ভাগ হ্রাস পায়। চাষাবাদ অন্যান্য ধানগুলোর মতো সহজ হওয়ায় সামগ্রিক খরচও অনেকটা কম হয়।

উদ্ভাবনের নেপথ্যের গবেষণা

পূর্বে ডক্টর আবেদ চৌধুরী তার পিএইচডি গবেষণাকালে "রেকডি" নামক একটি নতুন জিন আবিষ্কার করেন। এই উদ্ভাবন ৮০'র দশকে ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দিয়েছিল। তার উদ্ভাবিত ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধক রঙিন ভুট্টা বিশ্বজুড়ে বহুল সমাদৃত। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার অধীনে একদল বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত গবেষকদলের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন।

ডক্টর আবেদ চৌধুরী তার পিএইচডি গবেষণাকালে "রেকডি" নামক একটি নতুন জিন আবিষ্কার করেন। এই উদ্ভাবন ৮০'র দশকে ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দিয়েছিল। তার উদ্ভাবিত ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধক রঙিন ভুট্টা বিশ্বজুড়ে বহুল সমাদৃত।

ধান গবেষণার জন্য ডক্টর আবেদ চৌধুরী বেঁছে নিয়েছিলেন নিজের জন্মস্থান সিলেটের মৌলভীবাজার জেলা। সেখানকার কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের কানিহাটি গ্রামে প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি ধান নিয়ে গবেষণা করেন। শুরুটা হয়েছিল ২০১০ সালে ২৫ বর্গমিটার জমিতে ২০টি ধানের জাত নিয়ে। এগুলোর মধ্যে স্থানীয় জাতের পাশাপাশি ছিল ফিলিপাইন ও চীনসহ বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ধান। তার গবেষণার সহযোগী ছিল গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর কৃষকগণ, যারা মাঠপর্যায়ের গবেষণায় পুরোটা সময় পরিশ্রম করেছে।

কোনো রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ছাড়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধানের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে হাইব্রিড ঘটানো হয়। অতঃপর যে জাতগুলোর ধান পেকে যাওয়ার পর কাটা হলে আবার ধানের শীষ বের হয়, সেগুলোকে আলাদা করা হয়। এভাবে বেশ সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয় মোট ১২টি জাত। এরপর টানা ৩ বছর চলে চাষাবাদ। এখানে দেখা যায় জাতগুলোর প্রত্যেকটিই দ্বিতীয়বার ফলন দিচ্ছে। একই গাছে তৃতীয়বার ফলনের চেষ্টা করা হলে সেটিও সফলতা পায়। পরিশেষে চারটি জাত বাদে বাকি সবগুলো চতুর্থবার ফলন দেওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে।

অতঃপর গবেষণালব্ধ এই চারটি জাতের ওপর আলাদাভাবে মনোনিবেশ করে আরও সূক্ষ্মভাবে গবেষণা শুরু হয়। ২০২১ সালে জানুয়ারিতে ২ বিঘা পরিমাণ জমিতে রোপণ করা হয় বোরো ধানের এই চারটি জাত। উপযুক্ত

ইউরিয়া সার প্রয়োগের পাশাপাশি নেওয়া হয় সঠিক সেচ ও পরিচর্যা। এর ফলে ১১০ দিনের মধ্যে ফসল চলে আসে ৮৫ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিটার উচ্চতার গাছে। পরে পরিকল্পনামাফিক মাটি থেকে ঠিক ৩৫ সেন্টিমিটার উচ্চতায় ধান কেটে সংগ্রহ করা হয়।

সে বছর মে মাসের প্রথম দিকে প্রথম পর্যায়ে কাটা ধানে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হয় ৪ টন। তারপর থেকে ৪৫ দিন পর পর প্রতি মৌসুমে হেক্টরপ্রতি ফলন আসে ২ থেকে ৩ টন। সব মিলিয়ে জাতগুলো থেকে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৬ টন ফসল পাওয়া গেছে।

পঞ্চব্রীহি ধান চাষের পদ্ধতি

বছরের প্রথমে বোরোর মৌসুমে রোপণ করা যায় এ ধান। চারাগুলো রোপণ করতে হয় পরস্পরের থেকে ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে। এতে করে প্রত্যেকটি গাছ মাটি থেকে সমান শক্তি নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। এ ধান পাঁকতে ১১০ দিন সময় নেয়। অন্যান্য ধানের ক্ষেত্রে

সাধারণত প্রথমবার ধান কাটার পরে জমিকে আবার প্রথম থেকে প্রস্তুত করতে হয়। কয়েক সপ্তাহ এমনকি গোটা মাস খালি রাখার পর জমিতে আউশ বা আমন লাগানো যায়। কিন্তু এখানে ঐ বোরোর গাছ থেকেই ৪৫ দিন অন্তর অন্তর ২ বার আউশ এবং সবশেষে ২ বার আমন ধান পাওয়া যায়। প্রথমবারের তুলনায় পরের ফলনগুলোতে উৎপাদন কিছুটা কম হলেও ৫ বারের ফলন মিলিয়ে মোট উৎপাদন প্রায় ৫ গুণ বেশি হয়।

ধানের বীজ সংগ্রহের সময় পৃথক কোনো প্রক্রিয়া নেই। অন্যান্য ধানের মতো কৃষকরা নিজেরাই বীজ সংগ্রহ করতে পারেন। অন্য ধানের মতো একইভাবে চারা তোলার আগে বীজতলায় রোপণ করতে হয়।

নির্দিষ্ট পরিমাপে ধান কেটে নেওয়ার পর মোড়া অংশগুলোতে থাকা লতাপাতা ও ঘাস ছেঁটে সার দিতে হয়। পোকামাকড় ধরলে অন্য ধানের মতোই সামান্য কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। পঞ্চব্রীহির বেড়ে ওঠার জন্য পরিচর্যার এটুকুই যথেষ্ট। খুব শক্ত ধান কেননা ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যা এই গাছ নষ্ট করতে পারে না।

নতুন উদ্ভাবিত এই ধানের সম্ভাবনা

হেক্টর প্রতি ২০ টন উৎপাদন করা সম্ভব এই নতুন ধান। কিন্তু তার জন্য দেশের প্রতিটি কৃষকের জন্য এই ধান সহজলভ্য হতে হবে। ডক্টর আবেদ চৌধুরীর মতে, এ নতুন ধান চাষ পদ্ধতি সারা দেশের কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে গেলে আগামী ৫০ বছর দেশবাসীর খাদ্যের যোগান নিয়ে আর চিন্তার অবকাশ থাকবে না। এই চাষ একদিকে যেমন সময় বাঁচায়, অন্যদিকে অর্থের দিক থেকেও সাশ্রয়ী। পঞ্চব্রীহি নিয়ে এখনও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। এই জাত থেকে শুধু ৫ বার নয়, ভবিষ্যতে ৫ এর অধিক বারও ধান পাওয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ডক্টর আবেদ। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকগণ নতুন এই চাষাবাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবেন।

পঞ্চব্রীহি, যা এক রোপণে পাঁচবার ফলন দিতে সক্ষম। এই নতুন ধানের আবিষ্কার কৃষিকাজের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। ড. আবেদ চৌধুরী বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে কাজে চেয়েছেন। তিনি কৃষকের জমিতে নতুন সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করেছেন।

পঞ্চব্রীহি, যা এক রোপণে পাঁচবার ফলন দিতে সক্ষম। এই নতুন ধানের আবিষ্কার কৃষিকাজের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। ড. আবেদ চৌধুরী বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে কাজে চেয়েছেন। তিনি কৃষকের জমিতে নতুন সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করেছেন। অন্যদিকে, শামসুল হুদা অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছেন। এই দুই পথপ্রদর্শকের মিলিত প্রয়াসই পঞ্চব্রীহি ধানকে শুধু একটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন নয়, বরং জনসমবায় আন্দোলনের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

মাঠপর্যায়ে অভিজ্ঞতা (২৫ মে ২০২৫)

মৌলভীবাজারে গবেষণা মাঠ পরিদর্শনে অংশগ্রহণকারীরা হাতে-কলমে দেখেন কীভাবে একই গাছ থেকে পাঁচবার পর্যন্ত ধান পাওয়া যায়। প্রশ্নোত্তর পর্বে ড. আবেদ তুলে ধরেন–এই ধান কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় কীভাবে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। অংশগ্রহণকারীরা প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের অঞ্চলেও এ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পঞ্চব্রীহি ধানের মাধ্যমে কৃষকরা শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়াতে পারবে তা না, বরং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, নিরাপদ খাদ্য এবং সামাজিক শক্তি অর্জনে অগ্রগমী হবে। যা প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞান, অধিকার ও জনসমবায়ের সমন্বয়েই কৃষকের জীবন পরিবর্তন সম্ভব। এর নিরিখে কৃষি ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করতে পারে।

পঞ্চব্রীহি কেবল একটি ফসল নয়; এটি প্রান্তিক কৃষকের আশা, আত্মবিশ্বাস এবং নতুন সম্ভাবনার প্রতীক। ■

এএলআরডি'র জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এএলআরডির উদ্যোগে "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক গ্রামীণ ভূমিহীনদের ভূমিস্বত্ব এবং সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তি" কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে এ সময় দুইটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সভা অনলাইনে এবং অপরটি সরাসরি (অফলাইন) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এবং ২০২৫ সালের ৫-৬ জানুয়ারি এএলআরডি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উভয় সভায় সভাপতিত্ব করেন এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এএলআরডি'র উপনির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মনি এবং কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভাগুলোতে ১০টি সহযোগী সংস্থার ১০ জন নির্বাহী প্রধান এবং ১১ জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বিগত এক বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাঠ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এবং প্রতিটি সংস্থার অর্জন ও প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হয়। এতে লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ সংস্থার কার্যক্রমে গতি এসেছে ও উল্লেখযোগ্য অর্জন দৃশ্যমান হয়েছে। পাশাপাশি, অন্যান্য সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

যেহেতু প্রকল্পের শেষ বছর, তাই নির্বাহী পরিচালক ও উপনির্বাহী পরিচালক অর্জিত ফলাফলের ক্ষেত্রে আরও বেশি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কিছু দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন, যা সভায় উপস্থিত সকলেই একমত হয়ে গ্রহণ করেন।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ক) কমিউনিটি মবিলাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ রিফ্রেসার্স

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগঠন শক্তিশালী করতে মাঠকর্মীদের কার্যকর দক্ষতা ও প্রস্তুতি হিসেবে প্রকল্পের আওতায় ২৫-২৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দুই দিনব্যাপী **কমিউনিটি মবিলাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের একটি** বিশেষ রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এই কোর্সে এএলআরডি'র ১০টি সহযোগী সংস্থার এনিমেটর ও সুপারভাইজারদের

মোট ১৮ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। তাদের মধ্যে ৪ জন নারী এবং ১৪ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারি সেবায় প্রান্তিকজনের অন্তভুক্তি, বাজারে প্রবেশাধিকার, দল পরিচালনায় কমিউনিটি

মবিলাইজেশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, যৌথ চাষাবাদ ও সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং মবিলাইজেশনের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

খ) নেতাদের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন বিষয়ক কর্মশালা

গত ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ঢাকার এডিএসসি-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তৃণমূল নেতাদের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম গঠন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১১টি সহযোগী সংস্থা থেকে ২৯ জন নারীসহ মোট ৩৩ জন তৃণমূল নেতা-নেত্রী অংশগ্রহণ করেন।

এতে পূর্বের পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় জানা যায় যে, বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য নিজেদের দোকানেই বিক্রি করছেন। তাছাড়া তারা বাজার মূল্য বেশি পাওয়ার জন্য মৌসুমের বাইরে ফসল উৎপাদনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। কারণ এতে উৎপাদন খরচ বেশি হলেও বাজারমূল্য ভালো পাওয়া যায়। তবে এই ক্ষেত্রে তাড়ের অভিজ্ঞতা না থাকায় গতিশীলভাবে করতে পারছেনা বলে উল্লেখ করেন।

সুতরাং তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য এএলআরডি-র উপ-নির্বাহী পরিচালক মনে করেন, অংশগ্রহনকারী নেত্রীদের ঢাকার 'মিনা' বাজারের একটি আউটলেট পরিদর্শনে পাঠালে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে পারবেন। কর্মশারায় এই জাতীয় প্ল্যাটফর্মের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই নেত্রীরা প্রতিটি দলের সঙ্গে দুই মাস পরপর মতবিনিময় সভা করবেন। সরকারি অধিদপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখাবেন। সদস্যদের যৌথ বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করাবেন। দলগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়ন করবেন

আশা করা হচ্ছে, এই কর্মশালার মাধ্যমে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস ও সংগঠিত উদ্যোগ গড়ে তোলার যে প্রয়াস তা ভবিষ্যতে একটি শক্ত ভিত তৈরিতে সক্ষম হবে।

গ) ক্ষুদ্র খামারি ও যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ রিফ্রেসার্স

এএলআরডি ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই)-এর যৌথ উদ্যোগে ২০-২২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে তিনদিন ব্যাপী 'ক্ষুদ্র খামারি ও যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক' এক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ। এতে মোট ২৬ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। যার মধ্যে ১৮ জন ক্ষুদ্র খামারি ও যুব এবং ৮ জন উজ্জীবক। মূলত: বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে অনুশীলনের নিমিত্তে এই

প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল- খামার প্রযুক্তি ও আধুনিক গবাদি পালন কৌশল সম্পর্কে এবং খামার স্থাপনের উপযোগিতা ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। তাছাড়া অর্থনীতিভাবে লাভবান হওয়া ও আত্ম কর্মসংস্থান তৈরি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক খামার স্থাপনের দক্ষতা অর্জন। পাশাপাশি গবাদিপ্রাণির প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে আরো অভিজ্ঞতা অর্জন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। ড. রাজিয়া খাতুন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এফএসআরডি, বিএলআরআই-এর তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ও ছিলো। যেমন গবাদি পশুর টিকা প্রদান, খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সবুজ ঘাস সংরক্ষণ। প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা দক্ষ হয়ে উঠবেন, যা তাদের খামার পরিচালনায় সহায়ক হবে। পাশাপাশি, এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেশের খামারি ও কৃষিখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঘ) যুব নেতৃত্ব-বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক ভূমিহীনদের ভূমি-স্বত্ব এবং সরকারি সেবা প্রাপ্তি কর্মসূচীর আওতায় ২০-২২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে যুব নেতৃত্ব-বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ সারাদেশের ১০টি জেলার ১১টি উপজেলার ১১টি সহযোগী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণে মোট ২২ জন অংশগ্রহণকারি উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ৯ জন নারী এবং ১৩ জন পুরুষ।

প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে নেতৃত্বের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা, নেতার আচরণ ও প্রভাব, নারী নেতৃত্ব, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দ্বন্দ নিরসন, অ্যাডভোকেসি, লবিং ও নেটওয়ার্কিং, যুব নেতৃত্ব এবং যুব নেতৃত্বের পথে বাধাসমূহ। অধ্যাপক ড. রওশন আরা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) যুবদের আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, অধিকার ও দায়িত্ব, যুব সমাজের চাহিদা এবং অসন্তোষ দূরীকরণের কৌশল তুলে ধরেন। মোঃ সানিউল ফেরদৌস (উপ-প্রকল্প পরিচালক, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প) ডিজিটাল ভূমি সেবার বর্তমান অবস্থা এবং যুব সমাজের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা যৌথ উদ্যোগ ও সমবায় আন্দোলনে যুব সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যুব নেতৃত্ব বিকাশ, ভূমি-সেবা সচেতনতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে সমবায়ী চর্চার সম্প্রসারণে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

ঙ) নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও ভূমি অধিকারের উপর জনসমবায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা

২৪-২৫ মে ২০২৫ তারিখে মৌলভীবাজারের কানিহাটি গ্রামে আয়োজিত "নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও ভূমি অধিকারের উপর জনসমবায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা"-এর অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা ড. আবেদ চৌধুরীর উদ্ভাবিত পঞ্চব্রীহি ধানের মাঠ পরিদর্শন করেন, যেখানে তারা সরাসরি দেখতে পান কীভাবে একবার রোপণে পাঁচবার পর্যন্ত ফলন সম্ভব হয় এবং এর খরচ-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা প্রযুক্তির কার্যকারিতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় এর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ এলাকায় ট্রায়াল প্লট স্থাপন, সমবায়ী উদ্যোগে প্রযুক্তি বিস্তার ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই অভিজ্ঞতা জনসমবায় সদস্যদের মাঝে নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নের পথে এক সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

চ) ফলোআপঃ লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার প্রশিক্ষণ (এলএসপি)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ও এএলআরডি'র যৌথ উদ্যোগে ২০-২২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ক্ষুদ্র খামারিদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে ফরিদপুরের পলাশ, জবা ও কাশফুল দলের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

জবা দলের সদস্য শুকুরিজান বেগম ইতোমধ্যে অল্প কিছু মুরগি নিয়ে খামার করছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি খামারটি বড় আকারে বাড়ির আঙিনায় সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে নিয়ম মেনে খামার পরিচালনার মাধ্যমে লাভবান হচ্ছেন। তাঁর সফলতা দেখে একই এলাকার ছালমা বেগম নতুনভাবে মুরগির খামার শুরু করেছেন।

অন্যদিকে, কাশফুল দলের সদস্য মতিয়া বেগমের ছেলে মোমিন শেখ প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাগলের পিপিআর ভ্যাকসিন প্রদান, ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি এবং গরু পালনের কাজ শুরু করেছেন। তিনি গবাদি পশুর খামার গড়ে তুলেছেন এবং খাবার প্রস্তুতের জন্য ঘাস কাটার মেশিনও কিনেছেন।

এই উদ্যোগ স্থানীয় যুব ও নারী খামারিদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ছ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা ২০২৫

২৬ এপ্রিল ২০২৫, ঢাকায় এএলআরডি'র এডিএসসি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে "বাংলাদেশে টেকসই সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র গ্রামীণ প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মসূচির" বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা। কর্মশালার উদ্বোধন করেন এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, যিনি অংশীদারদের অভিনন্দন জানিয়ে নতুন সংস্থা মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)-এর যোগদানের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অধিকাংশ সমস্যা ভূমি সংক্রান্ত এবং খাসজমি আন্দোলনসহ

ভূমি অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে প্রকল্পটি কেবল উন্নয়নমূলক নয়, বরং অধিকারভিত্তিক কর্মসূচি, যেখানে ভূমিস্বত্ব, সরকারি সেবা প্রাপ্তি,বাজারে প্রবেশ, সমবায়ী চর্চা ও দলীয় চেতনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ তৈরি হচ্ছে।

কর্মশালায় পূর্ববর্তী প্রকল্পের শিখন, ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়। উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল খাসজমি উদ্ধারে সংঘাতের সম্ভাবনা, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, দলীয় পুঁজির অস্থিরতা, নারী সদস্যদের নিরাপত্তা ও পারিবারিক বাধা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। শিখনের মধ্যে আসে দলীয় ঐক্য ও নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে অধিকার আদায়ে সফলতা, সরকারি সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ঝুঁকিহীন উদ্যোগ গ্রহণে দক্ষতা অর্জন।

সহযোগী সংস্থাগুলো তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করেন। এসিডিএফ দলীয় শক্তির কারণে প্রভাবশালীদের চাপ প্রতিহত করার সক্ষমতা তুলে ধরে। এলডিও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরও জনসমবায় দলগুলোর ক্ষমতায়ন বজায় রাখার পরামর্শ দেন। মউক নারী সদস্যদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও আধুনিক চাষাবাদ শেখানোর গুরুত্ব উল্লেখ করে। রুলফাও স্থানীয় উদ্যোগ ও দলীয় সংগ্রামের সক্ষমতা এবং ডকুমেন্টেশনের ঘাটতি নির্দেশ করে।স্পিড ট্রাস্ট স্ট্রাকচারড অগ্রগতি এবং সরকারের শক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার দিকনির্দেশনা দেয়। বিএফএফ এলএসপি প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা, সদস্যদের খামার তৈরি এবং ক্ষুদ্রঋণ দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারের সঙ্গে অভিজ্ঞতা শেয়ার করে।

বিশেষ সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বলা হয়, দলগুলোকে আন্দোলন গড়ে তোলার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা, কার্যক্রমে ডকুমেন্টেশন ও ডেটা ম্যানেজমেন্ট জোরদার করা, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, আধুনিক কৃষি চর্চা ও বাজারজ্ঞান বৃদ্ধি, নতুন দল গঠন, পুরাতন দলের নির্ভরশীলতা কমানো, স্থানীয় সমস্যা ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি ও সরকারি সম্পর্ক জোরদার করা। এছাড়াও 'অপারেশনাল গাইডলাইন' চূড়ান্ত করা এবং সরকারি সেবায় দলের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়ার বিষয় গুলি উঠে আসে।

এএলআরডি-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মনি বলেন, ভূমিস্বত্ব, খাসজমি ও সরকারি পরিষেবা বিষয়ে দলের কাজ বাড়ছে যা আশাব্যঞ্জক। তিনি অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিটি কার্যক্রমে কৌশলগত পরিকল্পনা ও ডকুমেন্টেশন নিশ্চিত করতে এবং কার্যক্রমের ডেটা সংগ্রহ, রিপোর্ট ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। কর্মশালার মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাগুলো প্রকল্পের অর্জন, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য শুধু কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি নয়, বরং দলীয় চেতনায় গড়ে ওঠা, ভূমিস্বত্ব ও পরিবেশবান্ধব প্রান্তিক কৃষক সমাজ তৈরি করা।

জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি

গোলটেবিল সংলাপ "সমবায় সমিতি আইনের সংস্কার: ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সমবায় বিকাশের সুযোগ"

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে দৈনিক বণিকবার্তা কনফারেন্স রুমে "সমবায় সমিতি আইনের সংস্কার: ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সমবায় বিকাশের সুযোগ" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নারী অধিকারকর্মী খুশি কবির, চেয়ারম্যান, এএলআরডি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি।

আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করার ওপর, যাতে ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহজেই সমবায়ে অংশ

নিতে পারে। অংশগ্রহণকারীরা নারী ও প্রান্তিক কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকার ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং সদস্য সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার প্রস্তাব দেন।

অর্থায়ন ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ, বাজারজাতকরণ সহজীকরণ এবং সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে। আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে সঠিক নীতি ও সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকরা শুধু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হবেন না, বরং সমবায়ের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. রিজওয়ানুল ইসলাম, আইনজীবী অবন্তি নুরুল, উন্নয়নকর্মী আফজাল হোসেন ও আ ন ম ফজলুল হাদী। মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন জনসমবায় দলের নেতা শরীফা আক্তার নিপা, রাহেলা আক্তার ও চামেলী খাতুন। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন মো. নবীরুল ইসলাম ও মো. শরিফুল ইসলাম, সমবায় অধিদপ্তর।

তৃণমূলে সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম

স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি

"সরকারি কৃষিসেবা ও ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে গ্রামীণ নারী কৃষকের অর্ন্তভুক্তি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ" বিষয়ে সেমিনার

২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে রাজশাহীর এনজিও ফোরাম ট্রেনিং রুমে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে "সরকারি কৃষি সেবা ও ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে গ্রামীণ নারী কৃষকের অন্তর্ভুক্তি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ" বিষয়ে এক আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের

আয়োজক ছিল রুলফাও, রাজশাহী। এতে অংশগ্রহণকারী ছিলেন তানোর, নাটোর, পাবনা চাটমোহর কর্মএলাকার মিজরিও প্রকল্পের দলীয় সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সমমনা সংস্থার সদস্যরা। এতে মোট অংশগ্রহণকারী ছিলো ১১০ জন।

এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদার সভাপতিত্বে ও রুলফাও-এর পরিচালক আফজাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে তরফদার মোঃ আক্তার জামীল, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- এ. টি. এম. গোলাম মাহবুব, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী; শবনম শারমিন, উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, রাজশাহী এবং মোঃ মোহাব্বত আলী বিশ্বাস, জোনাল ম্যানেজার, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। আলোচনায় অংশ নেন- বিএলআরআই, রাজশাহী অঞ্চলের কর্মকর্তা ড. সুকুমার রায়, নারী উদ্যোক্তা ড. ফরিদা আক্তার কেয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সাবরিনা নাজ।

এতে জনসমবায় দলের সদস্যরা ভূমিহীন নারীদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। এসময় তারা নারীর পেশা কৃষক হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, জাতীয় পরিচয়পত্রে নারী কৃষক হিসেবে পেশা অন্তর্ভুক্ত, খাসজমি বন্দোবস্তে নারীদের এবং আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, গ্রামীণ নারী কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে বলে দাবি তোলেন।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা বলেন, প্রতি বছরে একাধিক বার ঋণ প্রদান করে থাকে এবং এটি আদিবাসীসহ সকল কৃষকের জন্য প্রযোজ্য।

অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন, কৃষকরা চাইলে ঋণের জন্য তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং একলক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিনা জামানতে প্রদান করা হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও তার সফলতার ওপর আলোকপাত করা হয়।

শবনম শারমিন (উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, রাজশাহী): তিনি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেবা কার্যক্রমের ওপর আলোচনা করেন। নারীর নেতৃত্ব এবং ক্ষমতায়ন উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণগুলির ভূমিকা তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

প্রধান অতিথি, তরফদার মোঃ আক্তার জামীল, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী, সেমিনারের বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের দেশের উন্নয়ন জনগণের হাতে হতে হবে, শুধুমাত্র সরকারের উপর নির্ভর করা যাবে না।" তিনি কৃষকদের উন্নয়নে সহযোগিতার অঙ্গীকার করে বলেন, "কৃষকের কৃষি ঋণ গ্রহণের বাধা দূর করতে প্রতিশ্রুতি দেন কোনো ধরনের বন্ধকি ছাড়াই কৃষকদের ঋণ প্রদান করার সুযোগ তৈরি করা হবে এবং প্রাণী সম্পদের সেবা গ্রহনের বাধা দূর করতে সহায়তা করব।"

সভাপতি, শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি, বলেন, "নারী উন্নয়নের অন্যতম বাধা নিরক্ষরতা, যা দূর করতে গণশিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগ প্রয়োজন। দেশের ৭০% নারী কৃষিতে অবদান রাখেন, তবে তারা যথাযথ কৃষি সেবা পান না।"

বক্তারা সেমিনারের আলোচনায় সরকারি কৃষি সেবা, ব্যাংক ঋণ ও নারীদের কৃষি ক্ষেত্রে সেবা পাওয়ার চ্যালেঞ্জগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বক্তৃতাগুলি গ্রামীণ নারী ও যুবকদের উন্নয়ন এবং তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যা কৃষি সেবা, ব্যাংক ঋণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব। এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ নারী কৃষকদের উন্নয়ন ও তাঁদের কৃষি সেবার মধ্যে বৈষম্য দূর করার পথে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোকে জনগণের কাছে তুলে ধরা। এই সেমিনারের মাধ্যমে, গ্রামীণ নারী কৃষকের উন্নয়ন এবং তাদের কৃষিতে স্বীকৃতি পাওয়ার পথ সুগম হতে পারে, যা দেশের কৃষি খাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গ্রামীণ নারীদের কৃষি খাতে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উঠে আসে।

সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সরকারি প্রণোদনা ও প্রকল্পের সুবিধা অধিকাংশ সময় প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। এই বাস্তবতায় স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি সেবাগুলো যাতে সহজ, সঠিক ও কার্যকরভাবে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত মানুষের কাছে বিশেষ করে নারীদের

কাছে পৌঁছায় তার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা করে থাকেন। কারণ এই সভাগুলো অধিকার বা সরকারি সুবিধা প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবেদন সময় স্থানীয় পর্যায়ে মোট ৪২টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় উপজেলা কৃষি অফিস, প্রাণিসম্পদ অফিস, সমবায় অফিস এবং মহিলা বিষয়ক অফিসের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন। তারা জনসমবায় দলের সদস্যদের সরকারি সেবা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় হয়েছে। এর

ফলে তারাগঞ্জ উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কাছ থেকে জনসমবায় দলের সদস্যরা ছাগলের পিপিআর ও অন্যান্য রোগের টিকাদান এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট পেয়েছেন। একই উপজেলায় কৃষি অফিস থেকে ২২ জন সদস্য বীজ ও সার এবং ২ জন সদস্য কৃষি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কৃষি কর্মকর্তা নারী কৃষকদের কৃষি কার্ড, প্রশিক্ষণ এবং পারিবারিক পুষ্টি বাগান বিষয়ে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এসব কার্যক্রমের ফলে জনসমবায় দলের সদস্যরা সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে আগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন, এবং কর্মকর্তারাও তাদের কার্যক্রম দেখে আরও আন্তরিক সহযোগিতা করছেন। এটি সরকারি সেবার কার্যকর ও ন্যায্য বণ্টনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ক্যাম্পেইন ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন

দিবস উদ্‌যাপন

অধিকার আদায়ে বৃহত্তর শক্তি অর্জনের কৌশল হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তাতিক দিবস পালিত হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এই সময় এএলআরডি'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে ৩টি দিবস উদযাপন করেছে। দিবসগুলো হলো-

ক) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৪:

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে ১০টি জেলার ১১টি সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। যার মধ্যে আলোচনা সভা, র‍্যালি, পণ্য প্রদর্শনী ও সেমিনার ছিলো উল্লেখযোগ্য। এসব কর্মসূচিতে গ্রামীণ জনগণ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণির

মানুষ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় পর্যায়ের এসব কর্মসূচিতে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। দিবসটির উপলক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়, যার মধ্যে ভূমিহীন নারীদের খাসজমি প্রদান, উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করা, কৃষিজীবী নারীদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং কৃষি কার্ড প্রদান, গ্রামীণ নারী কৃষকদের সহজ শর্তে কৃষি সংক্রান্ত সরকারি সেবা, প্রযুক্তি সেবা, ভর্তূকি, কৃষিঋণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পাওয়ার সুযোগ দেওয়া, বাজারে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষণ করা, কৃষিসহ সকল খাতে নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ছিলো উল্লেযোগ্য। এই দাবীগুলি গ্রামীণ নারী ও কৃষকদের উন্নয়ন, সুরক্ষা, এবং সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা ভবিষ্যত কর্মসূচি এবং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

খ) জাতীয় সমবায় দিবস-২০২৪ উদযাপন:

কৃষি উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় ব্যবস্থার ভূমিকা বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। সমবায় ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়ন ও জনকল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। সমবায় সমিতি এমন একটি সংগঠন, যা সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে সহায়তা প্রদান করে। বিশেষভাবে, প্রান্তিক

কৃষক ও নারী কৃষকদের জন্য এটি এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি, লাভজনক বিপণন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এবারের জাতীয় সমবায় দিবস-২০২৪ উপলক্ষে ১১টি সহযোগী সংস্থা সমবায় দিবস উদযাপন করে, যার মধ্যে ১০টি সংস্থার উদ্যোগে র‍্যালি, আলোচনা সভা, পণ্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়, সরকারের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়। যেমন- গ্রামীণ নারী কৃষকদের সমবায়ের অন্তর্ভুক্তি, নারী কৃষক সংগঠন গঠন, সমবায় আইন সংস্কার ও গণমুখী সমবায় আইন প্রণয়ন, নারী সমবায়ীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনে সহজ করতে হবে, প্রান্তিক নারীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, গ্রামভিত্তিক জনসমবায় গড়ে তুলতে হবে, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে, জনসমবায়ের অংশীদারিত্ব স্বীকৃতি দিতে হবে।

এই দাবিগুলোর মাধ্যমে সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন, বিশেষ করে প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এভাবে সমবায় ব্যবস্থা এবং কৃষি বিষয়ক উদ্যোগগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করলে দেশের কৃষি খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রা আরও সমৃদ্ধ হবে।

গ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫:

"পরিবর্তনের এখনই সময়" এই স্লোগানকে সামনে রেখে ৮ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৭টি সহযোগী সংস্থা মউক, আসুস, রুলফাও, স্পিডট্রাস্ট, ডাব্লউসিডিবি, সিডিএ, এসিডিএফ নারী সদস্যদের অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোচনা সভা ও র‍্যালি আয়োজন করে। স্থানীয় ভাবে আয়োজিত এ কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য ছিল "নারীর অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন–নারী ও কন্যার উন্নয়ন।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকা- সমান অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। অনুষ্ঠানে উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিসার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় অফিসারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জনসমবায় দলের সভাপতি, সম্পাদক, ক্যাশিয়ার এবং অন্যান্য সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, "জেন্ডার সমতা মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নারীদের জন্য বিনিয়োগ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ভিত্তি।" প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বৈষম্য ও দারিদ্র্য বাড়িয়ে নারীদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল গ্রহণ জরুরি। তিনি ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, খারিজ বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ নেওয়ার পরামর্শ দেন এবং ভূমিহীন পরিবারের জন্য খাসজমি প্রাপ্তি একটি নৈতিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করেন। যেমন; জিকেএস,তারাগঞ্জ; প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন–

"জেন্ডার সমতা মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নারীদের জন্য বিনিয়োগ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ভিত্তি।" প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বৈষম্য ও দারিদ্র্য বাড়িয়ে নারীদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল গ্রহণ জরুরি।

- বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বৈষম্য ও দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে নারীদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে বিকল্প অর্থনৈতিক মডেলের দিকে অগ্রসর হতে হবে।
- ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, খারিজসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
- ভূমিহীন পরিবারের জন্য খাসজমি প্রাপ্তি একটি নৈতিক অধিকার; এ বিষয়ে দরখাস্তের সুযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন স্থানের প্যানেল আলোচনায় বক্তারা জনসমবায় সদস্যদের বিভিন্ন সেবা পাওয়ার দিকনির্দেশনা দেন–

- কৃষি অফিসার কৃষি কার্ড, পুষ্টি বাগান, সার, বীজ ও কৃষি প্রশিক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন।
- মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নারীদের কণ্ঠস্বর আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।
- সমবায় অফিসার রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং নিবন্ধনের প্রতিশ্রুতি দেন।

নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসন, কৃষি দপ্তর, মহিলা বিষয়ক অফিস ও সমবায় অফিস থেকে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভা জনসমবায় সদস্যদের জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলনে এটি আরও গতি সঞ্চার করবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভা জনসমবায় সদস্যদের জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলনে এটি আরও গতি সঞ্চার করবে।

জনসমবায় নেতাদের সমন্বয় সভা: ভূমিস্বত্ব ও সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে অগ্রগতি

ক্ষুদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক গ্রামীণ ভূমিহীনদের ভূমিস্বত্ব ও সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জনসমবায়' দলের নেতানেত্রীদের সমন্বয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিটি সংস্থা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবেদন সময় প্রতিটি সংস্থা ১টি করে মোট ১১টি সহযোগী সংস্থায় ৬২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সংস্থা হলো: গ্রাউস (ময়মনসিংহ), এসিডিএফ (মধুপুর, টাঙ্গাইল), মউক (মেহেরপুর), সিডিএ (দিনাজপুর), ডব্লিউসিডিবি (ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর), বিএফএফ (ফরিদপুর), স্পিডট্রাস্ট (বাউফল, পটুয়াখালী), রুলফাও (তানোর, রাজশাহী), এলডিও (চাটমোহর, পাবনা) ও জিকেএস (তারাগঞ্জ, রংপুর)। এর ফলে আন্তঃদলীয় সমন্বয় ও সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটছে। পিছিয়ে পড়া দলের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাদেরকে সহযোগিতা বাড়ছে।

উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ ও প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের মধ্যে, ফলে অন্য দলগুলোর মধ্যেও অংশগ্রহণের আগ্রহ বাড়ছে। ভূমিহীন সনদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া এবং কৌশল এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় শেয়ার করা হচ্ছে–যার ফলে এ পর্যন্ত ১১৪ জন ভূমিহীন ব্যক্তি সনদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সমন্বয় সভাগুলো জনসমবায়ের কার্যক্রমের বিস্তার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

সাফল্যে গাথা:

মুষ্টি চাল থেকে মজবুত জীবন: দল গড়েই ঘর জিতলেন মালারাণী

মালারানী বর্মন, বয়স এখন পঞ্চান্ন ছুঁই ছুঁই। উত্তর গাছাবাড়ীর এক কোণায় ছোট্ট একটি উঠোন, তার পাশে বাঁশ, টিন ও বেড়া মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জরাজীর্ণ ঘর। এই ঘরেই এক সময় স্বামী-স্ত্রী মিলে ছিলেন মালারাণী বর্মণ। তিন ছেলে, এক মেয়েকে নিজের হাতেই মানুষ করেছেন। সন্তানরা বড় হয়ে গেছে, যার যার সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই সব ওলটপালট হয়ে গেল–প্রায় ১৫ বছর আগে মালারাণীর স্বামী মারা গেলেন।

জীবনের সেই বাঁকে এসে একা হয়ে গেলেন মালারাণী। মাত্র ০.০৫ শতাংশ জমির ওপর ছেলেরা তাদের ঘর তুলেছে, বউ ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চলছে তাদের জীবন। মালারাণীর ঘর ছিল আলাদা–একটি কুড়ে ঘর, যেটির ছাউনিতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ত বর্ষায়, আর শীতে ঢুকতো হিম হাওয়া। শেষমেশ ঝড়ের রাতে একদিন সেই ঘরও ধ্বসে পড়ে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে থাকতে শুরু করলেন অন্যের বারান্দায়–একজন মা, বিধবা, আদিবাসী নারী, যার নিজের বলে কিছুই আর রইল না। ঠিক তখনই জীবনে এলো নতুন মোড়। এএলআরডি-এর সহায়তায় "আ.বিমা কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এসিডিএফ)" নামক সংগঠনটি উত্তর গাছাবাড়ী গ্রামে গারো ও বর্মন আদিবাসী নারীদের নিয়ে একটি দল গঠনের উদ্যোগ নেয়। এসিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক ও এনিমেটরের আহ্বানে মালারাণীসহ ১৪ জন নারী একত্র হন এবং গঠন করেন একটি জনসমবায় সংগঠন যার নাম "উত্তর গাছাবাড়ী আদিবাসী মহিলা উন্নয়ন দল"।

দলের নিয়ম ছিল–প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে এক মুঠো করে চাল জমা দেবে। ছোট্ট এক মুষ্টি চাল, কিন্তু বড় আশার বীজ। সেই চাল বিক্রি করে টাকা জমা হতে থাকে দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। শুধু চাল নয়, দলটি হয়ে ওঠে আলোচনার জায়গা– তাদের ভবিষ্যৎ, নারীর মর্যাদা, একতা, অধিকারের কথা নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে।

এসিডিএফ ও এএলআরডি সদস্যদের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন–সরকার আদিবাসীদের জন্য ঘর দেয়, পশু সম্পদ দেয়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা দেয়।

মালারাণীর জীবনেও সেই আলো পৌঁছায়। দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে স্থানীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করে দলটি মালারাণীর জন্য ঘর বরাদ্দের দাবি তোলে। এরপরই স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বন বিভাগের ৭ শতাংশ জমির ওপর তার নামে এশটি ঘর বরাদ্দ হয় এবং জমির প্রত্যয়নও নিশ্চিত হয়। শুধু ঘরই নয়–পশুসম্পদ অধিদপ্তর থেকে এশটি বকনা বাছুর পান তিনি এবং নিয়মিত বয়স্ক ভাতাও পেতে শুরু করেন।

আজ মালারাণীর নিজস্ব একটি ঘর আছে। ঘরের পেছনে আছে একটুকরো খালি জায়গা, যেখানে তিনি গরু বাঁধেন, শাকসবজি চাষ করেন। তার মুখে এখন সাহসের ভাষা–

"এসিডিএফ-এর মাধ্যমে দল গঠন না করলে কোনোদিন জানতেই পারতাম না সরকার আমাদের জন্য কিছু দেয়। এখন আমি জানি, আমার নিজের জায়গা আছে, ঘর আছে, গরু আছে–আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি একা নই।"

> "মালারাণীর গল্প শুধু তার একার নয়। এটি হলো বাংলাদেশের হাজারো প্রান্তিক, আদিবাসী, একক নারীর গল্প - যাদের জীবন বদলে যেতে পারে একটুখানি সহায়তা, সচেতনতা এবং সম্মিলিত উদ্যোগে। এক মুষ্টি চাল, একতা এবং একটি সাহসী সিদ্ধান্তই একজন নারীকে এনে দিতে পারে নিরাপত্তা ও সম্মান। জনসমবায়ভিত্তিক সংগঠন ও অধিকারভিত্তিক আন্দোলনগুলোই আজ এদের জীবন বদলে দেওয়ার সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয়ে উঠেছে।"

এসিডিএফ পরিচালক বলেন "মালারাণীর গল্প শুধু তার একার নয়। এটি হলো বাংলাদেশের হাজারো প্রান্তিক, আদিবাসী, একক নারীর গল্প - যাদের জীবন বদলে যেতে পারে একটুখানি সহায়তা, সচেতনতা এবং সম্মিলিত উদ্যোগে।

এক মুষ্টি চাল, একতা এবং একটি সাহসী সিদ্ধান্তই একজন নারীকে এনে দিতে পারে নিরাপত্তা ও সম্মান। জনসমবায়ভিত্তিক সংগঠন ও অধিকারভিত্তিক আন্দোলনগুলোই আজ এদের জীবন বদলে দেওয়ার সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয়ে উঠেছে।"

আলতাফনের আত্মনির্ভরতা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রঘুনাথপুর আশ্রয়ন প্রকল্পে বসবাসকারী আলতাফন খাতুন একসময় ছিলেন চরম দুঃস্থ ও অবহেলিত। স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই সন্তান সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনি একা হয়ে পড়েন। ছোট্ট একটি টং দোকান চালিয়েও জীবিকা নির্বাহ করতে পারছিলেন না, এমনকি বিধবা ভাতাও পাননি। এই সংকটময় সময়ে তিনি জানতে পারেন যে রঘুনাথপুরে নারীদের একটি জনসমবায় দল রয়েছে, যারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। যোগাযোগ করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর এনিমেটর কাজলরেখার সঙ্গে এবং দলীয় সদস্যদের অনুমতিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ ও সঞ্চয় জমা করার মাধ্যমে তিনি এক বছরের মাথায় দলের সভাপতির দায়িত্ব পান।

২০২৩ সালের মার্চে সমবায়ের পুঁজি থেকে একটি ছাগল পালনের জন্য তাকে দেওয়া হয়। বর্তমানে তার ছাগল সংখ্যা ৯টি, একটি ছাগল বিক্রি করে তিনি নিজের দোকানে পণ্য তুলেছেন এবং ব্যবসায় উন্নতি করেছেন। তার সাফল্য দেখে গ্রামে আরও ৩ জন ছাগল পালন শুরু করেছে এবং সফল হয়েছে।

আলতাফন এখন স্বাবলম্বী, নাতি-নাতনিদের লেখাপড়ায় সহায়তা করছেন এবং ভবিষ্যতে ৩০টি ছাগলের খামার করার স্বপ্ন দেখছেন। রঘুনাথপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সভাপতি বাবর আলী বলেন, "সমাজে এখন তিনি একজন রোলমডেল।" নিজেই বলেন, "এএলআরডি ও মউকের মাধ্যমে জনসমবায়ে যোগ দিয়ে আজ আমি মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছি।"

এই গল্প শুধু আলতাফনের নয়, এটি জনসমবায়ের হাত ধরে নারীর আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক।

লাখি আক্তার এর আত্ম-প্রতিষ্ঠার গল্প

পরিশ্রম ও মনের জোর থাকলে সব কিছুই সম্ভব। ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে বড় শক্তি। কথাগুলো বলছিলেন লাখি আক্তার, বয়স ৩০ বছর, ফরিদপুর আরশাদ মুন্সির ডাঙ্গী পলাশ নারী জনসমবায় দলের সদস্য। তিনি বলেন, জনসমবায় দলের সাথে যুক্ত হয়ে আজ আমি অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়েছি। আনন্দের সাথেই কথাগুলো বলছিলেন আগে আমি অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এখন আমি নিজেই কাজ করে সংসার চালাই।

লাখি আক্তার বলেন তারা চার ভাই এক বোন ও বাবা মা সহ পরিবারে সাত জন সদস্য ছিলো। বাবা ছিলো শারীরিক প্রতিবন্ধি। তার নৌকা চালিয়ে সংসার চালাতে হতো এবং তাতে অনেক হিমসিম খেয়ে যেতো। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় পড়ালেখা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি, বাবা ও ভাই মিলে জোরপূর্বক ফারুখ শেখের সাথে বিয়ে দেন লাখি আক্তারকে।

স্বামী ফারুখ শেখের আগের একটা বউ ছিলো। কিছুদিন সংসার করার পর যৌতুকের কারণে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে লাখি আক্তার বাবার বাড়ি চলে আসেন। অভাবের সংসারে এসে লাখি আক্তারের জীবনে নেমে আসে আরো দুঃসহ যন্ত্রণা। কিছুদিন পরে তার আবার বিয়ে হয় ছামাদ শেখ এর সাথে। ছামাদ শেখ ছিলেন বিবাহিত। প্রথম বউ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ছামাদ শেখ লাখি আক্তারকে বিয়ে করে। এক বছর পর তাদের একটা ছেলে হয়, তার কিছুদিন পর ছামাদ শেখ তাকে ও তার সন্তানকে রেখে চলে যায় আগের বউয়ের কাছে। ছেলেকে নিয়ে লাখি আক্তারের শুরু হয় জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই। সন্তানের কথা চিন্তা করে তিনি নিজ পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন এবং বিএফএফ এর সাথে যুক্ত হয়ে শুরু করেন নতুন অধ্যায়। তিনি বলেন "বিভিন্ন মিটিং ও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হয়েছি, নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। প্রশিক্ষণ, জ্ঞান, দক্ষতা, যৌথভাবে পুঁজি সংগ্রহ করে, যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে পেরেছি।"

বি.এফ.এফ সাথে যুক্ত হয়ে এখন আমরা নারীরা পুরুষের সাহায্য ছাড়াই জমিতে চাষ করছি এবং নিজেরাই বেপারির সাথে কথা বলে ফসল বিক্রয় করতে পারছি। আগের তুলনায় অনেক স্বাবলম্বী হয়েছি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পেরেছি। যেমন: সরকারি পরিষেবা, বাজারে প্রবেশগম্যতা, ভূমির অধিকার। অদম্য মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রম করে স্বামী পরিত্যক্তা নাম পরিবর্তন করে নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে পারছি।

লাখি আক্তার বলেন এতো কিছুর পরেও আমি ভাবতে পারিনি আমার সন্তানকে নিয়ে আমি এতোদূরে এগিয়ে আসতে পারবো। বেনিফিসিয়ারিজ' ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম (বি. এফ.এফ) এর সাথে যুক্ত হয়ে পলাশ নারী জনসমবায় দলের সদস্য হয়ে আজ আমি অনেক টাই স্বাবলম্বী। ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় জমা করে যৌথ কৃষির মাধ্যেমে আজ আমি কিছু একটা করতে পারছি। তিনি বলেন বি.এফ.এফ-এর সহযোগিতায় একটি গাভী পেয়েছি, সেই গাভী লালন পালন করছি এবং তার পাশাপাশি রাজমিস্তিরির কাজ করছি। ইচ্ছাশক্তি, কঠোর প্ররিশ্রম ও যৌথ চাষাবাদের কারণে আশা করছি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরো স্বাবলম্বী হতে পারবো।

আত্মনির্ভরশীলতায় রূপান্তরিত মোজেদা খাতুনের জীবন

মোজেদা খাতুন তার বাড়ির উঠানে বসে জৈব সার বস্তায় তুলছিলেন, আর বলছিলেন, "আমি আশার আলো নারী জনসমবায় দলের একজন দলীয় সভানেত্রী। আমার এবং আমার পরিবারের অনেক দিন কষ্টে দিন কাটিয়েছি; কখনো খাবার সংকটেও পড়েছি।" তার সংসারে তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। স্বামী দিনমজুর এবং তিনি গৃহিণী হওয়ায় সংসার চালানো ছিল দারুণ কঠিন।

প্রায় সাত বছর আগে গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস) তার মাধ্যমে এলাকার নারীদের একটি মিটিং ডাকেন। তারা জানায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য জনসমবায় দল গঠন করা হবে। দল গঠনের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ, সরকারি সেবা আদায় এবং স্থানীয় স্তরে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে। মোজেদা নেতৃত্বে এলাকার ২৫ নারী সংগঠিত হয়ে গঠন করেন "আশার আলো নারী জনসমবায় দল", যা বর্তমানে ২০ সদস্যের।

দল গঠনের পর মোজেদা এবং সদস্যরা গ্রাউসের বিভিন্ন মিটিং ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন, সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সরকারি সেবা আদায়ের সক্ষমতা অর্জন করেন। ২০১৮ সালে তারা জৈব সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত জৈব সার তৈরি শুরু করেন। প্রথমে বিক্রি করতে কিছু অসুবিধা হলেও, উপসহকারী কৃষি অফিসার হারুনুর রশিদের পরিচয় এবং গ্রাউসের সহায়তায় তারা সফলভাবে সার বাজারজাত করতে সক্ষম হন।

২০১৮ সালে মোজেদা জৈব সার বিক্রির জন্য অর্থনৈতিকভাবে সফল নারী হিসেবে পুরস্কৃত হন। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে তাকে ৬টি রিং, ৬ পাতা টিন, ৬টি খাম ও ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। বর্তমানে তার কাছে ১৮টি রিং রয়েছে এবং মাসে প্রায় ২০,০০০ টাকার সার বিক্রি করেন। তিনি শুধু নিজের সারই নয়, দলের আরও ৭ জন সদস্যের সারও বাজারজাত করেন।

গ্রাউস এবং এএলআরডির সহযোগিতায় প্রতি দুই মাসে

অনুষ্ঠিত নলেজ শেয়ারিং মিটিং-এ কৃষি অফিসাররা সরাসরি পরামর্শ দেন। মোজেদার কাছে ভার্মি কম্পোস্ট সেপারেটর মেশিন বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়, যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়া সহজ হয়।

আজ মোজেদা আত্মনির্ভর নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। নিজের নামে ১৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন, দুটি গরুর মালিক হয়েছেন এবং চারটি গ্রামে দলীয়ভাবে ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদন ও বিক্রয় করছেন। তার অনুপ্রেরণায় দলের সদস্য ফজিলাও স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। মোজেদার উদ্যোগ ও নেতৃত্বের ফলে এলছাপাড় এলাকায় ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদনে বিশেষ পরিচিতি তৈরি হয়েছে।

মোজেদা জানাচ্ছেন, "বিশ্বাস, অদম্য চেষ্টা এবং পরিশ্রম মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। আমি গ্রাউস এবং এএলআরডির কাছে কৃতজ্ঞ, যারা আমাদের মতো পিছিয়ে থাকা নারীদের পথ দেখিয়েছে এবং স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে।"

খনার বচন

"কার্তিক মাসে দুধে ভাসে, অগ্রহায়ণে ধানে ভাসে।"

অর্থ: কার্তিকে গাভীর দুধ ও অগ্রহায়ণে নতুন ধান–গ্রামীণ পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির ভারসাম্যকে নির্দেশ করে।

"আশ্বিন মাসে মাটিতে বোনা, শীতে খাইবে কৃষক রোনা।"

অর্থ: সরিষা, ডাল ও শীতকালীন সবজি যদি আশ্বিনে বোনা যায়, তবে শীতে কৃষকের চাহিদা পূরণ হয়।

সংকলনে: তারা খাতুন

এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট-এর পক্ষে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক ৬/৬, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক শামসুল হুদা। দাম : ৫ টাকা।